JAN. 13 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

কে. জি. মুস্তাফা

সার্ক চলছে শম্বুকগতিতে

একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত হল গত ৬ জানুয়ারি ২০০২ সালে। ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কে টানাপোড়েন, বিশেষ করে কারগিল যুদ্ধের দরুন এবং নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বাহাদুর সপরিবার নিহত হওয়ার কারণে শীর্ষ সম্মেলন বিলম্বিত হল। এর আগে ১৯৯৮ সালের মে মাসে কলম্বোতে দশম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ধারা ব্যাহত হয়। কাঠমাণ্ডু সম্মেলনে দারিদ্র্য বিমোচন; সন্ত্রাস দমন ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ইউনিয়ন গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। নানা বিপত্তির মধ্যেও সার্ক চলছে, যদিও শম্বুকগতিতে।

সম্মেলন হবে কি হবে না এ নিয়ে বেশ অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। নেপালে বামপন্থী সশস্ত্র আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলে সার্ক সম্মেলন নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেওবা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলে সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সে আয়োজন নিয়েও সংশয় দেখা দেয় ভারতের জাতীয় পার্লামেন্ট ভবনে পাকিস্তানের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী আত্মঘাতী হামলা হওয়ার পর। গত ১৩ ডিসেম্বরের ওই হামলায় নিহত হয় পাঁচজন সন্ত্রাসীসহ মোট ১৩ জন। ভারতের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই পাকিস্তানভিত্তিক কাশ্মীরী জঙ্গি সন্ত্রাসী প্রতিষ্ঠান লস্কর-ই-তৈয়বা ও জয়শ-ই-মোহাম্মদ ওই হামলার জন্য দায়ী। ভারত দাবি করে, পাকিস্তানকে এই হামলার জন্য দায়ী সন্ত্রাসীদের তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। কতকটা আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান এবং ওসামা বিন-লাদেনের আল কায়দার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণার মতো। যুক্তরাষ্ট্র ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে দুনিয়া কাঁপানো নিউইয়র্ক টুইন টাওয়ার ধ্বংসের দায়িত্ব চাপায় তালেবান শাসকগোষ্ঠী এবং আল কায়দা যোদ্ধাদের ওপর। যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে, ওসামা বিন-লাদেন এবং তালেবান নেতা মোল্লা ওমরকে জীবিত অথবা মৃত তাদের হাতে অর্পণ করতে হবে। পাকিস্তান সরকার লস্কর-ই-তৈয়বা ও জয়শ-ই-মোহাম্মদের বহুসংখ্যক সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু ভারতের হাতে তাদের তুলে দিতে রাজি হয়নি। পাকিস্তান সামরিক সরকারের মতে, লস্কর-ই-তৈয়বা ও জয়শ-ই-মোহাম্মদ সন্ত্রাসী দল নয়, তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত এবং সেই কারণে তাদের ভারতের হাতে অর্পণ করা যাবে না। ভারত এ দাবি অগ্রাহ্য করেছে। এই পরিবেশে উপমহাদেশের পরমাণু শক্তিধর দুই রাষ্ট্রের সমরপ্রস্তুতি চলতে থাকে পুরোদমে। সীমান্তে সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম মোতায়েন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, যেকোন মুহূর্তে উভয় দেশের বড় আকারের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় পক্ষকে ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানায়। তাদের আহ্বানে এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের আপস প্রচেষ্টায় যুদ্ধের আশু আশঙ্কা দূর হয়। সেই আপাত অনুকূল পরিবেশে নেপালে নিরুপদ্রবে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়। তা সত্ত্বেও একথা বললে ভুল হবে না যে, কাঠমাণ্ডুতে শান্তির সুবাতাস বইতে পারেনি।

দিল্লি ও ইসলামাবাদকে আলোচনার টেবিলে বসানোর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। ঢাকায় দু'দিন সফর শেষ করে তিনি ভারতে যান এবং সেখান থেকে পাকিস্তান। পাকিস্তান সরকারের অবশ্য লস্কর-ই-তৈয়বা ও জয়শ-ই-মোহাম্মদ সংগঠনের কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে বলে টনি ব্লেয়ারকে জানানোর কথা। ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা তার দূতিয়ালিতে কতটা সফল হচ্ছেন সেটা দেখার সময় এসেছে। একথা সত্য যে, টনি ব্লেয়ার মূলত জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রতিনিধি হিসাবেই ভারত-পাকিস্তান সফর করেছেন। সেদিক থেকে তার প্রভাব শুধু একজন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে বেশি। জেনারেল মোশাররফ এবং অটল বিহারি বাজপেয়ি সে সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন। জর্জ ডব্লিউ বুশের বার্তা এবং ব্লেয়ারের উপস্থিতি ভারত ও পাকিস্তানকে সংযম প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে বলেই মনে হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এটা অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের আফগান নীতির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে পাকিস্তানের সহযোগিতার ওপর। একইভাবে পাকিস্তানের সামরিক নেতাও জানেন, দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে ভারতকে বাদ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন রণনীতি অথবা পুনর্গঠন নীতি প্রণয়ন করবে না।

আমেরিকার আফগান যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। তারা লাদেনকে ধরতে পারেনি এখনও, পারেনি মোল্লা ওমরকে কব্জা করতে। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের পুনর্গঠনের কাজ বলতে গেলে আরম্ভই হয়নি। আন্তর্জাতিক সৈন্য বাহিনী গঠন সম্পূর্ণ হয়নি আজও। এ সময় আমেরিকার প্রয়োজন ভারত ও পাকিস্তানের

কাঠমাণ্ডুর রাজপ্রাসাদে নৈশভোজে যোগদানের আগে সার্কভুক্ত সাত জাতির নেতৃবৃন্দ

পূর্ণ কূটনৈতিক সহযোগিতা। সে দিক থেকে দেখলে মনে হয়, টনি ব্লেয়ারের দৌত্য যদি ফলপ্রসূ না হয় তাহলে প্রতিরক্ষা সচিব রামসফেল্ড অথবা পররাষ্ট্র সচিব কলিন পাওয়েল শিগগিরই এ অঞ্চলে আবার আসবেন এবং সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে পাকিস্তান ও ভারতের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করবেন। উভয় দেশের সীমান্তে সৈন্য বাহিনী 'আইবল-টু-আইবল' পজিশনে অবস্থান করেও সংযম দেখাতে পারে। কাশ্মীর ভ্যালিতে জঙ্গি বাহিনীগুলোর তৎপরতা বন্ধ করা কঠিন কাজ। তাদের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করাও সম্ভব নয়। তবে তাদের জঙ্গিরা যাতে পাকিস্তানের সামরিক সাহায্য না পায় তার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখাই সমীচীন।

জেনারেল পারভেজ মোশাররফ সন্ত্রাসবাদ এবং স্বাধীনতার যুদ্ধকে এক করে দেখার বিরোধিতা করেছেন সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে। কিন্তু এ দুই প্রক্রিয়া অনেক সময় একীভূত হয়ে যায় এবং তার ফলে পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতির ডিভাইডিং লাইন অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে। উন্নয়নগামী বিশ্বের প্রায় সব মুক্তি সংগ্রামকেই উপনিবেশকারীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী অপতৎপরতা বলে অভিহিত করেছে। এমনকি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং মুক্তিবাহিনীর নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারেনি। পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে মিত্র বাহিনী অর্থাৎ মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে প্রথাগত যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ একসঙ্গে চলেছে। বাংলাদেশের নারী-পুরুষ পাকিস্তানি হানাদারদের হটানোর জন্য যেভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়, সেভাবে কাশ্মীরের সর্বশ্রেণীর মানুষ একাট্টা হলে কাশ্মীরী স্বাধীনতাকামীরাও সাফল্যের মুখ দেখবে।

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল পারভেজ মোশাররফ প্রতীকী করমর্দন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ির সঙ্গে। সার্কের বিদায়ী চেয়ারপারসন চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার মধ্যস্থতায় পাক-ভারত শীর্ষ নেতৃদ্বয় রুদ্ধদ্বার কক্ষে পাঁচ মিনিট একান্তে কথা বলেছেন। এটাও মূলত সার্কের নিয়ম রক্ষার প্রতীকী আলোচনা। প্রকৃত প্রস্তাবে কাঠমাণ্ডুতে বরফ গলেনি। টনি ব্লেয়ারের ওয়ানম্যান ডিপ্লোম্যাসি কতদূর সফল হয়েছে তা নির্ভর করছে তিনি দিল্লি-ইসলামাবাদ সম্পর্কের জমে ওঠা বরফ কতটা গলাতে পারলেন তার ওপর।

পাকিস্তান আজও পর্যন্ত স্বাধীন কাশ্মীর দাবির প্রতি সমর্থন জানায়নি। তারা চায় কাশ্মীরী জনগণের পাকিস্তানে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা পাকিস্তানে অবস্থানরত আজাদ কাশ্মীর নেতারা চাইলেও ভারতের শাসনাধীন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অধিবাসীরা চায় কিনা তা নিয়ে কোন জরিপ হয়েছে বলে মনে হয় না। বিগত অর্ধশতাব্দী যাবৎ এই সমস্যার কোন সুরাহা খুঁজে দেখারও উদ্যোগ নেয়া হয়নি। 'শেরে কাশ্মীর' শেখ আবদুল্লাহ এই শর্তটি তুলেছিলেন এক সময়, যখন তিনি দাবি করেন, কাশ্মীরের গণভোটে তিনটি বিকল্প থাকতে হবে, দুটি নয়। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, কাশ্মীর ভারতে যোগ দেবে না পাকিস্তানে, সেটা নির্ধারণের জন্য গণভোট হবে। ভারত সে প্রস্তাব প্রথমে গ্রহণ করলেও পরে অগ্রাহ্য করে 'ফ্যাক্টস অন দি গ্রাউন্ড' বদলে গেছে এই যুক্তিতে। শেখ আবদুল্লাহ তার তৃতীয় অপশন নিয়ে মাঠে নামেন। আবদুল্লাহর প্রস্তাব ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই অগ্রাহ্য করে। পরিস্থিতি এখনও বদলায়নি।

এখানে একটি অসমর্থিত প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে চাই। কথাটা আমাকে বলেছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি তখন করাচিতে একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগ দিয়ে ঢাকা এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী স্যার ফিরোজ খান নূন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর মধ্যে এক বৈঠকে সাব্যস্ত হয় যে, কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে চুপ থাকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কূটনীতি। কারণ, কোন পক্ষেরই নিজ নিজ দাবিতে অটল থাকা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু চুপ থাকার কথাটিও প্রকাশ করা যাবে না। নেহরু পরলোকগমন করেন ১৯৬৪ সালে। তার এক বছর পরেই পাকিস্তানের সমরনায়ক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে, ইস্যু কাশ্মীর। ভারত যখন ১৯৬২ সালে চীনের বিরুদ্ধে সীমান্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত তখনও পাকিস্তান চুপ থাকার কূটনীতি ভঙ্গ করেনি। এমনকি, ১৯৬১ সালে নেহরু পাকিস্তান সফর করেন তারবেলা ড্যাম উদ্বোধন উপলক্ষে। কিন্তু ১৯৬২ সালের পর উপমহাদেশের রাজনীতি, কূটনীতি, সমরনীতি সবই পাল্টে গেল। ফলে দুই হাজার দুই সালের প্রারম্ভেও আমরা পাক-ভারত সংকট তথা কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভাবিত।

লেখাটা শুরু করেছিলাম ২০০২ সালের একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে। পাকিস্তান ও ভারতের কূটনীতিতে কাশ্মীর একটি বিশেষভাবে হাইলাইট করা বিষয়। সাউথ এশিয়ার দেশগুলো নিয়ে একটি আঞ্চলিক ফোরাম গড়ে তোলা যায় কিনা এ নিয়ে যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান চিন্তাভাবনা করছেন, তখনই এ প্রশ্নটি উঠেছিল যে, ভারত ও পাকিস্তান যেখানেই বসবে সেখানেই কাশ্মীর বিতর্ক উঠবে। এ বিতর্কে বাংলাদেশ পারতপক্ষে জড়াতে চায় না। দক্ষিণ এশীয় ফোরামে কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার বাইরে রেখে কি করে চলা যায়, সে বিষয়ে জিয়াউর রহমান এবং তার 'থিংক ট্যাংক' সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান কিছুসংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যের হাতে নিহত হন। ১৯৮৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তার দেহরক্ষীদের গুলিতে প্রাণ হারান। ঢাকায় রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে প্রথম সার্ক সম্মেলনের আয়োজন করেন। রাজীব গান্ধী তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। শ্রীলংকার প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব জুনিয়াস জয়েবর্ধনে রাষ্ট্রপতি। পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় জেনারেল জিয়াউল হক। নেপালে বীরেন্দ্র বীর বিক্রম তখন রাজা। ভুটান ও মালদ্বীপে কোন পরিবর্তন হয়নি। কাশ্মীর সমস্যাকে পাশ কাটানোর জন্য সিদ্ধান্ত হয় যে, সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে কোন দ্বিপক্ষীয় বিষয় আলোচনায় আনা হবে না। একই কারণে এবারও কাঠমাণ্ডু ঘোষণায় কাশ্মীর সমস্যার উল্লেখ নেই। পর্দার আড়ালে যাই ঘটুক না কেন। কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হয় না বলে পাকিস্তান সার্ক নিয়ে তেমন উৎসাহী নয়। ভারতও বিগ ব্রাদার মনোভাব নিয়ে অবশিষ্ট ছয় সদস্যের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকায়। সার্কের সাফল্য-অসাফল্য নিয়ে দিল্লি তেমন মাথা ঘামায় না। ফলে সার্ক আজও পর্যন্ত একটি এতিম প্রতিষ্ঠান হিসাবে টিকে আছে। সার্ককে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার ফোরাম হিসাবে গড়ে তোলার যে আগ্রহ দেখা যায় অধিকাংশ সদস্যের মধ্যে, সে আগ্রহ বাস্তবে রূপ নিতে পারে না ভারতের উৎসাহের অভাবে। অন্যদের উৎসাহ থাকলেও কম। তাছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক একদা এশিয়ার ইমার্জিং টাইগার, আসিয়ান থাকলেও ইদানীং গিইয়ে গেছে অর্থনৈতিক কারণে। সার্ক অর্থনৈতিক ইউনিয়ন সম্পর্কে তা নিয়েও সংশয় দেখা দিতে পারে।

কে. জি. মুস্তাফা :